শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা প্রস্তুত

সজীব সরকার

৯ মে ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৮ মে ২০১৯ ২৩:০৬

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে আবহাওয়ায় যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তা অনেকাংশেই নানা দুর্যোগের ঝুঁকি তৈরি করছে। আমাদের মতো দুর্বল অবকাঠামোর দেশের অবস্থান এসব ঝুঁকির তালিকায় বেশ ওপরের দিকে। আরও শঙ্কার কথা হলো, এসব দুর্যোগ মোকাবিলা কিংবা দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠাÑ কোনোটির জন্যই আমরা প্রস্তুত বা সক্ষম নই। এই অবস্থায় নিজেদের নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ বেশ ওপরের দিকে রয়েছে। ইউনিসেফের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এ কারণে বাংলাদেশের প্রায় দুই কোটি শিশু ঝুঁকিতে রয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে ১ কোটি ২০ লাখ শিশু। তাদের বসবাস দেশের নদীতীরবর্তী এলাকায়। এর বাইরে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত আরও ৪৫ লাখ শিশু ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। আরও ৩০ লাখ শিশুর বসতি রয়েছে দেশের খরাপ্রবণ অঞ্চলে। দুর্যোগে আক্রান্ত হলে এসব পরিবারের শিশুরা তাদের শৈশবকালীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ও নিরাপত্তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিভিন্ন সময় আমরা দেখি, দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার পর অনেক শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। তাদের মধ্যে ছেলেশিশুরা প্রায়ই ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত হয় আর মেয়েদের একটি বড় অংশ বাল্যবিয়ের শিকার হয়। বিভিন্ন গবেষণা বলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদ্যমান আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিকবলয়ে পশ্চাৎপদতার মতো কারণেই মূলত এটি ঘটে থাকে। আর এর মধ্যেও শিশুদের কথা, বিশেষ করে ভাবা দরকার। আজকের শিশুরা ভবিষ্যতের কর্ণধার। পরিণত বয়সে তারাই দেশের সব পর্যায়ের যাবতীয় কর্মকা- নেতৃত্ব দেবে। তাই এসব দুর্যোগে তাদের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, এদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেয়া দরকার। এ জন্য অন্যসব বিষয়ের মধ্যে নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তা থাকাটি বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। বাংলাদেশ শিক্ষা-তথ্য ও পরিসংখ্যান বুযুরোর (ব্যানবেইস) সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সালে ১৪ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্যানবেইসের ২০১৮ সালের প্রতিবেদনের খসড়ায় গত বছর দেশের দুর্যোগকবলিত এলাকাগুলোয় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিস্থিতি যাচাই করে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে মোট ১৪ হাজার ২৬৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্যোগের পর

সরকারি-বেসরকারি বা কখনো কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু প্রতিষ্ঠান মেরামত করা হয়। তবে মোট ক্ষতির তুলনায় এটি একেবারেই নগণ্য সংখ্যায় ঘটে এবং বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এসব দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। আমরা দেখিÑ নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা বা ঝড়-বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের নানাপ্রান্তে অগুণতি বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আবার জরাজীর্ণ ভবনে ধসের ঝুঁকির মধ্যে ক্লাস চলে। ছাদধসের আতঙ্কে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের বাইরে খোলা আকাশের নিচে পাঠরত শিক্ষার্থীদের খবরও আমরা গণমাধ্যমে দেখি। সঠিক সময়ে এগুলো মেরামতের ব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে নেওয়া হয় না। এসব দুর্যোগের বিপরীতে আমাদের প্রস্তুতি কতটা? ভাঙন থেকে রক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনের পাশে কাঁকর ও বালির বস্তা ফেলা হয়। তবে এভাবে যে শেষতক বিদ্যালয়ের ভবন রক্ষা পায়, এমন নজির খুব কম। এভাবে প্রতিবছর দেশের অজস্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। দেশের অনেক অঞ্চলে বহু বছরের পুরনো জরাজীর্ণ ভবনগুলো মেরামত বা পুনর্নির্মাণ না করেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নতুন ভবনও অনেক সময় অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঝুঁকিপূর্ণ এসব ভবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলে। যখন ইট-পলেস্তরা খসে পড়তে শুরু করে, তখন শ্রেণিকক্ষ স্থানান্তরিত হয় ভবনের বাইরে খোলা আকাশের নিচে অথবা কোনো গাছতলায়। এভাবেই চলছে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। সম্প্রতি আমরা দেখেছি, ৭ এপ্রিল বরগুনায় তালতলীর ছোটবগি পি কে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাদের বিম ধসে পড়ে তৃতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নিহত ও একই শ্রেণির আরও ১০ শিক্ষার্থী আহত হয়। এর দুই দিন পর ৯ এপ্রিল বরগুনারই আরেকটি স্কুলে একটি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। সম্প্রতি এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত একাধিক খবরের তথ্য মতে, কেবল বরিশালেই ৫৯৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা রয়েছে। এখানে লক্ষাধিক শিশু পাঠ নিচ্ছে মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে। এর পর ১১ এপ্রিল একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়, অতিজরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে সারাদেশে এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। আর জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। নির্মাণের পর আর কোনো সংস্কার করা হয়নি অনেক ভবন, এমনকি ১০ বছর আগে পরিত্যক্ত ঘোষিত বিদ্যালয়েও চলছে পাঠদান। 'শিক্ষাই জাতির মেরুদ-' আর 'আজকের শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ'Ñ এ ধরনের গালভরা কথা বলতে আমরা সবাই পছন্দ করি, এমনকি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরও এসব বিষয়ে লিখতে ও পড়তে হয়। আধা ভাঙা ছাদের নিচে কিংবা খোলা আকাশের নিচে তপ্ত রোদের মধ্যে বসে যে শিশু এ বিষয়ে 'ভাবসম্প্রসারণ' কিংবা 'রচনা' লেখেÑ তার মরমে এই ভারী কথাগুলো কতটা পৌঁছায়, সেটি কি ভেবে দেখা হয়? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে দীর্ঘদিনেও যেমন মেরামত করা হয় না, তেমনি পাঠদানের বিকল্প পথ নির্ধারণেও প্রচুর কালক্ষেপণ করা হয়। আর বিকল্প যে উপায়ে পাঠদান চলে, তা শিশুর জীবনে গুণগত তেমন কোনো পরিবর্তন আনে না। উপযুক্ত উপায়ে তথ্য সন্ধান করে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্ভবপর সর্বোচ্চমাত্রায় দুর্যোগ সহনীয় করে নির্মাণ করা গেলে দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার বিষয়টিকে এড়ানো যাবে। এর পাশাপাশি বেশি ঝুঁকিতে থাকা অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ে প্রশিক্ষণের আওতায় আনাও জরুরি। ব্যানবেইসের এক গবেষণায় আগে বলা হয়েছিলÑ ২০১৭ সালে বন্যা, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার মতো নানা দুর্যোগের কবলে পড়া তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ২০১৬ সালে ইউনেস্কো ও ব্যানবেইস পরিচালিত ভিন্ন এক গবেষণায় বলা হয়, মূলত পূর্বপ্রস্তুতি না থাকার কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে না। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, দুর্যোগ মোকাবিলায় তাৎক্ষণিকভাবে নগদ অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলের ৮৫ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের কোনো তহবিল নেই। গবেষণার অধীন ৮০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তারা দেখতে পান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এগুলোয় কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি, এমনকি ৭০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে দুর্যোগের পর প্রাথমিক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। আর বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলের দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ নেই। যেহেতু আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয়টি এক রকম নিয়মিত ব্যাপার, সেহেতু তা মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতিও থাকা চাই। প্রস্তুতি না থাকার কারণে এসব প্রতিষ্ঠানে ক্ষতির মাত্রা বেশি। তাই দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতির পাশাপাশি আবার দুর্যোগ-পরবর্তী তা কাটিয়ে উঠে পাঠদানের প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে শুরুর মতো সামর্থ্যও তৈরি করা দরকার। এটি করা না গেলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ফণীর কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের সহস্রাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। বন্ধ রয়েছে বহু বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেবল নয়, জরুরি ভিত্তিতে পাঠদান কার্যক্রম শুরুর ব্যাপারেও যতœশীল হওয়া দরকার। বাংলাদেশ শিশু অধিকারবিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য দলিলে স্বাক্ষরকারী দেশ। এ ছাড়া আমাদের সংবিধানেও শিশু অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাই শিক্ষার মতো শিশুদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে আর উপেক্ষা না করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থাসহ সবাই দ্রুত সচেতন ও সক্রিয় হবেনÑ এমনটিই প্রত্যাশা। য় সজীব সরকার : সহকারী অধ্যাপক, জার্নালিজম, কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং লেখক ও গবেষক।